আত্ তূর

৫২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ والطور থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ–প্রমাণ থেকে বুঝা যায়, মক্কী জীবনের যে যুগে সূরা আয যারিয়াত নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও সে যুগে নাযিল হয়েছিল। সূরাটি পড়তে গিয়ে একথা অবশ্যই মনে হয় যে, এটি নাযিল হওয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তবে তখনও চরম জুলুম–অত্যাচার শুরু হয়েছিল বলে মনে হয় না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু আখেরাত। সূরা যারিয়াতে এর সম্ভাবনা, অবশ্যম্ভাবিতা এবং সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছিল। সে জন্য এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। তবে আখেরাত প্রমাণকারী কয়েকটি বাস্তব সত্য ও নিদর্শনের শপথ করে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, তা নিশ্চিতভাবেই সংঘটিত হবে এবং তার সংঘটন রোধ করতে পারে এ শক্তি কারো নেই। এরপর বলা হয়েছে তা সংঘটিত হলে তার অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হবে এবং তা বিশ্বাস করে তাকওয়ার নীতি অবলম্বনকারীগণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত দ্বারা কিভাবে পুরস্কৃত হবেন।

এরপর কুরাইশ নেতারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে নীতি অনুসরণ করে চলছিল দ্বিতীয় রুকূ'তে তার সমালোচনা করা হয়েছে। কখনো তারা নবীকে (সা) গণক, কখনো পাগল এবং কখনো কবি বলে আখ্যায়িত করে সাধারণ মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতো যাতে মানুষ তাঁর আনীত বাণীর প্রতি ধীর ও সুস্থ মস্তিষ্কে মনোযোগ না দেয়। নবীকে (সা) তারা নিজেদের জন্য একটি মহা বিপদ বলে মনে করতো এবং প্রকাশ্যেই বলতো, তার ওপর কোন বিপদ আপতিত হলে আমরা তার হাত থেকে বেঁচে যেতাম। তারা তাঁর বিরুদ্ধে এ বলে অভিযোগ করতো যে, এ কুরআন তিনি নিজেই রচনা করছেন এবং আল্লাহর নামে পেশ করছেন। তাই তিনি যা করছেন তা ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বার বার উপহাস করে বলতো নবুওয়াত দানের জন্য আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তিকে ছাড়া আর মানুষ

খুঁজে পাননি। তারা তাঁর ইসলামী আন্দোলন ও তা প্রচারের বিরুদ্ধে এতই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতো যে, তিনি যেন কিছু চাওয়ার জন্য তাদের পিছু লেগে রয়েছেন আর তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাঁর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা নিজেরা বসে বসে চিন্তা করতো, তাঁর বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত করলে তাঁর এ আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এসব করতে গিয়ে তারা কি ধরনের জাহেলী ও কুসংস্কারমূলক আকীদা–বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে যার গভীর অন্ধকার থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে নিজের জীবনপাত করছেন সে সম্পর্কে কোন অনুভূতিই তাদের ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণের সমালোচনা করে পরপর কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। এসব প্রশ্নের প্রতিটি হয় তাদের কোন অভিযোগের জবাব, নয়তো তাদের কোন মূর্খতা বা কুসংস্কারের সমালোচনা। এরপর বলা হয়েছে, ঐ লোকদেরকে আপনার নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসী বানানোর জন্য কোন মু'জিযা দেখানো একেবারেই অর্থহীন। কারণ, এরা এমন একগুঁয়ে যে, তাদেরকে যাই দেখানো হোক না কেন এরা তার অন্য কোন ব্যাখ্যা করে পাশ কাটিয়ে যাবে এবং ঈমান গ্রহণ করবে না।

এ রুকূ'র শুরুতেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এসব বিরোধী শক্তি ও শত্রুদের অভিযোগ ও সমালোচনার তোয়াক্কা না করে তিনি যেন নিজের আন্দোলন ও উপদেশ–নসীহতের কাজ ক্রমাগত চালিয়ে যেতে থাকেন। রুকূ'র শেষাংশে তাঁকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি যেন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত এসব বিরোধিতার মোকাবিলা করতে থাকেন। এর সাথে সাথে তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রভু তাঁকে শত্রুদের মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে অসহায় ছেড়ে দেননি। বরং সবসময় তিনি তাঁর তদারক ও তত্ত্বাবধান করছেন। তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময় না আসা পর্যন্ত আপনি সবকিছু বরদাশত করতে থাকুন এবং নিজ প্রভুর 'হামদ ও তাসবীহ' অর্থাৎ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে সেই শক্তি অর্জন করুন যা এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাজ করার জন্য দরকার হয়।

وَالطُّوْرِ ۝١ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٢ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٣ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٤ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝٦ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۝٨ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۝٩ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠

তূরের[১] শপথ এবং এমন একখানা খোলা গ্রন্থের শপথ যা সূক্ষ্ম চামড়ার ওপর লিখিত।[২] আর শপথ আবাদ ঘরের,[৩] সুউচ্চ ছাদের[৪] এবং তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের।[৫] তোমার রবের আযাব অবশ্যই আপতিত হবে যার রোধকারী কেউ নেই।[৬] তা ঘটবে সেদিন, যেদিন আসমান প্রচণ্ডভাবে দুলিত হবে[৭] এবং পাহাড় শূন্যে উড়তে থাকবে।[৮]

১. তূর শব্দের প্রকৃত অর্থ পাহাড়। আর الطور শব্দের অর্থ সেই বিশেষ পাহাড় যার ওপরে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসাকে নবুওয়াত দানে সম্মানিত করেছিলেন।

২. প্রাচীন কালে যেসব গ্রন্থ ও লিখিত বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজন হতো সেগুলোকে কাগজের পরিবর্তে হরিণের চামড়ায় লেখা হতো। বিশেষত এসব চামড়া লেখার জন্য পাতলা অথবা ঝিল্লির আকারে তৈরী করা হতো এবং পরিভাষায় একেই رق বলা হতো। আহলে কিতাবগণ সাধারণত এই رق এর ওপরেই তাওরাত, যাবুর, ইনযীল এবং নবীদের সহীফাসমূহ লিখে রাখতো যাতে তা দীর্ঘ দিনের জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে। এখানে খোলা গ্রন্থ অর্থ আহলে কিতাবের কাছে বর্তমান পবিত্র গ্রন্থসমূহের এ সমষ্টি। একে উন্মুক্ত কিতাব বলার কারণ হচ্ছে তা দুষ্প্রাপ্য ছিল না, বরং পাঠ করা হতো এবং তাতে কি লিপিবদ্ধ ছিল তা সহজেই অবহিত হওয়া যেতো।

৩. হযরত হাসান বাসরীর মতে 'আবাদ ঘর' অর্থ খানায়ে কা'বা যা কোন সময়ই হজ্জ, উমরা এবং তাওয়াফ ও যিয়ারতকারী থেকে শূন্য থাকে না। কিন্তু হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদা, দাহ্হাক, ইবনে যায়েদ ও অন্য সব মুফাস্সিরদের মতে এর অর্থ বায়তুল মা'মূর যার উল্লেখ মি'রাজের প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন এবং যার দেয়াল গাত্রে তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লামকে হেলান দিয়ে থাকতে দেখেছিলেন। মুজাহিদ, কাতাদা ও ইবনে যায়েদ বলেন, পৃথিবীবাসীদের জন্য খানায়ে কা'বা যেমন আল্লাহ্ পরস্তদের কেন্দ্র তেমনি প্রত্যেক আসমানে তার বাসিন্দাদের জন্য একটি করে কা'বা আছে যা আল্লাহর ইবাদাতকারীদের জন্য অনুরূপ কেন্দ্রের মর্যাদা রাখে। মি'রাজের সময় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সব কা'বার একটির দেয়ালে হযরত ইবরাহীমকে হেলান দিয়ে থাকতে দেখেছিলেন। এর সাথে হযরত ইবরহীমের সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কারণ তিনিই ছিলেন পৃথিবীর কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। এ ব্যাখ্যাটি সামনে রেখে বিবেচনা করলে তা হযরত হাসান বাসরীর ব্যাখ্যার পরিপন্থী হবে না। বরং দু'টি ব্যাখ্যা মিলিয়ে আমরা এভাবে বুঝতে পারি যে, এখানে কেবল পৃথিবীর কা'বার শপথ করা হয়নি বরং বিশ্ব–জাহানে বর্তমান সমস্ত কা'বার শপথ এর মধ্যে অন্তরভুক্ত আছে।

৪. উঁচু ছাদ অর্থ আসমান, যা পৃথিবীকে একটি গম্বুজের মত আচ্ছাদিত করে আছে বলে মনে হয়। এখানে এ শব্দটি গোটা উর্ধ জগতকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ক্বাফ, টীকা ৭)

৫. মূল আয়াতে اَلْبَحْرِالْمَسْجُوْرِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে কোন কোন মুফাস্সির একে 'আগুনে ভর্তি' অর্থে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ একে শূন্য ও খালি অর্থে গ্রহণ করেন যার পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ একে আবদ্ধ বা আটকিয়ে রাখা অর্থে গ্রহণ করেন। তাদের মতে এর অর্থ হচ্ছে, সমুদ্রকে আটকিয়ে বা থামিয়ে রাখা হয়েছে যাতে তার পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হারিয়ে না যায় এবং স্থলভাগকে প্লাবিত করে না ফেলে এবং পৃথিবীর সব অধিবাসী তাতে ডুবে না মরে। কেউ কেউ একে মিশ্রিত অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ এর মধ্যে মিঠা ও লবণাক্ত পানি এবং গরম ও ঠাণ্ডা সব রকম পানি এসে মিশ্রিত হয়। আর কেউ কেউ একে কানায় কানায় ভরা ও তরংগ বিক্ষুব্ধ অর্থে গ্রহণ করেন। এসব অর্থের মধ্যে প্রথম দু'টি অর্থের পরিবেশ ও অবস্থার সাথে কোন মিল নেই। সমুদ্রের এ দু'টি অবস্থা, অর্থাৎ এর তলদেশ ফেটে সমস্ত পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তা আগুনে পূর্ণ হয়ে যাবে—কিয়ামতের সময় প্রকাশ পাবে। যা সূরা তাকভীরের ৬ আয়াত এবং সূরা ইনফিতারের ৩ আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। এ অবস্থা এখন বর্তমান নেই, ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। তাই এ ঘটনার শপথ করে বর্তমান কালের লোকজনকে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার কথা কি করে বিশ্বাস করানো যেতে পারে? তাই এ দু'টি অর্থ বাতিল করে اَلْبَحْرِالْمَسْجُوْرِ অর্থ আবদ্ধ, মিশ্রিত, পূর্ণ ও তরংগ বিক্ষুব্ধ অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. এটি সেই মহাসত্য যার জন্য এ পাঁচটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে। রবের শাস্তি অর্থ আখেরাত। যেহেতু এখানে আখেরাত বিশ্বাসকারীদের সম্বোধন না করে আখেরাত অবিশ্বাসকারীদের সম্বোধন করা হয়েছে আর তাদের জন্য আখেরাত আসার অর্থই হচ্ছে আযাব আসা তাই তাকে কিয়ামত, আখেরাত কিংবা প্রতিফল দিবস বলার পরিবর্তে "রবের আযাব" বলা হয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা বলে যে পাঁচটি জিনিসের

শপথ করা হয়েছে তা কিভাবে কিয়ামতের সংঘটিত হওয়া প্রতিপাদন করে এখন একটু গভীরভাবে তা ভেবে দেখুন।

তূর এমন একটি জায়গা যেখানে একটি অবদমিত ও নিষ্পেষিত জাতির উত্থান ঘটানো এবং একটি বিজয়ী ও জালেম জাতির পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আর এ সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক বিধানের (Physical law) ভিত্তিতে ছিল না বরং নৈতিক বিধান (Moral law) ও প্রতিফল বিধানের ভিত্তিতে ছিল। তাই আখেরাতের পক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে তূরকে একটি উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মত একটি অসহায় জাতির উত্থান ঘটানো এবং ফেরাউনের মত এক জবরদস্ত শাসককে সেনাবাহিনীসহ ডুবিয়ে দেয়া—যার ফায়সালা এক নিঝুম রাতে তূর পর্বতে গৃহীত হয়েছিল—এ ব্যাপারে মানবেতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত যে বিশ্ব-জাহানের বিশাল সাম্রাজ্যের স্বভাবসুলভ দাবী এই যে, মানুষের মত একটি বুদ্ধিমান ও স্বাধীন সৃষ্টির নৈতিক জবাবদিহি ও কর্মফল বিধানের আওতায় থাকা উচিত। আর এ দাবীর পূর্ণতা সাধনের জন্যই এমন একটি হিসেবের দিন আবশ্যক যেদিন গোটা মানব জাতিকে একত্রিত করে তার হিসেব নেয়া হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যারিয়াত টীকা ২১)

পবিত্র আসমানী গ্রন্থসমূহের শপথ করার কারণ হচ্ছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় যত নবী-রসূল এসেছেন এবং তাঁরা যেসব কিতাব এনেছেন, প্রতি যুগে তাঁরা সেই একটি মাত্র খবরই দিয়েছেন যা আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিচ্ছেন। অর্থাৎ পূর্বের ও পরের সমস্ত মানুষকে জীবিত হয়ে একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কৃতকর্ম অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে। এমন কোন আসমানী কিতাব কখনো আসেনি যাতে এ খবর দেয়া হয়নি। কিংবা উল্টা মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ দুনিয়ার জীবনই জীবন। মৃত্যুর পরে তো মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। সুতরাং এ জীবনের পরে কোন হিসেব-নিকেশের বালাই নেই।

বায়তুল মা'মূরের শপথ করার কারণ হলো, সে যুগে বিশেষভাবে আরবের লোকদের জন্য কা'বা ঘরের ইমারত এমন একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যা আল্লাহর নবী-রসূলদের সত্যবাদিতার স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছিল এবং মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ হিকমত এবং চরম শক্তিমত্তা যে তাদের পৃষ্ঠপোষক সে সাক্ষও পেশ করছিল। এসব আয়াত নাযিলের আড়াই হাজার বছর পূর্বে উষর ও জনবসতিহীন পাহাড়সমূহের মধ্যে কোন লোক-লস্কর ও সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই এক ব্যক্তি আসেন এবং তাঁর স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে রেখে চলে যান। কিছুদিন পর সে ব্যক্তি পুনরায় সেখানে আসেন। এই জনহীন স্থানটিতে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেন এবং লোকজনের প্রতি এ বলে আহবান জানান, হে লোকজন, এখানে আস এবং এ ঘরে হজ্জ আদায় করো। এ নির্মাণ কাজ ও আহবান এমন বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ঐ ঘরটিই সমগ্র আরববাসীর কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ আহবানে সাড়া দিয়ে মানুষ আরবের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে লাব্বায়কা লাব্বায়কা বলে ছুটে আসে। আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত এ ঘর এমন শান্তির আস্তানা হয়ে থাকে যে, এর চারদিকে গোটা দেশময় খুনখারাবি চলতে থাকলেও এ ঘরের সীমানায় এসে কারো গায়ে হাত তোলার দুঃসাহস কারো হয় না। তাছাড়া এ ঘরের

কল্যাণেই আরব ভূমি প্রতি বছর চার মাসের জন্য এমন নিরাপত্তা লাভ করে যে, কাফেলাসমূহ তখন নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করে, ব্যবসা–বাণিজ্য জমে ওঠে এবং ক্রয়–বিক্রয়ের জন্য বাজার বসতে থাকে। তাছাড়া এ ঘরের এমন প্রভাব বজায় থাকে যে, পুরো এ সময়–কালে অতি বড় কোন জালেমও সেদিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। আর যে এরূপ দুঃসাহস করেছে সে আল্লাহ তা'আলার এমন গযবের শিকার হয়েছে যে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। এসব আয়াত নাযিল হওয়ার মাত্র ৪৫ বছর পূর্বে লোকজন এ রকম একটি মজার ঘটনা নিজ চোখে দেখেছিল এবং তা দর্শনকারী বহু লোক সে সময় মক্কায় জীবিতও ছিল। এমন পরিস্থিতিতেই এ আয়াতগুলো তাদের শোনানো হচ্ছিলো। আল্লাহর নবী যে ফাঁকা বুলি আওড়ান না এর চেয়ে তার বড় প্রমাণ আর কি হতে পারতো? আল্লাহর নবীদের চোখ এমন কিছু দেখতে পান যা অন্যদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তাদের মুখ থেকে এমন সব মহাসত্য বেরিয়ে আসে সাধারণ মানুষের বিবেক–বুদ্ধি যার ধারে কাছেও যেতে পারে না। তাঁরা বাহ্যত এমন অনেক কাজ করেন যা দেখে এক যুগের লোক পাগলামি মনে করে বসে। কিন্তু তা দেখেই শতশত বছরের পরের লোকজন তাদের দূর দৃষ্টিতে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। এ ধরনের মহান ব্যক্তিগণ সর্বসম্মতভাবে প্রতি যুগেই যখন এ খবর দেন যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং 'হাশর নাশর' অনুষ্ঠিত হবে, তখন তাকে পাগলের প্রলাপ মনে করাটাই পাগলামি।

সুউচ্চ ছাদ (আসমান) এবং তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের শপথ করার কারণ হলো, এ দু'টি জিনিস আল্লাহর হিকমত এবং ক্ষমতার প্রতি ইংগিত করে। তাছাড়া এ হিকমত ও ক্ষমতা দ্বারাই আখেরাতের সম্ভাব্যতা, অনিবার্যতা ও সংঘটিত হওয়া প্রমাণিত হয়। আসমান কিভাবে এ বিষয়ে ইংগিত করে সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে সূরা ক্বাফের ব্যাখ্যায় ৭নং টীকায় আলোচনা করেছি। বাকী থাকে শুধু সমুদ্রের বিষয়টি। তবে যে ব্যক্তি মুক্ত মনে ও অস্বীকার করার আগাম হঠকারী সিদ্ধান্ত ছাড়া সমুদ্র সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করবে, তার মন সাক্ষ দিতে বাধ্য যে, পৃথিবীর বুকে পানির এত বড় ভাণ্ডারের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়াটাই এমন এক কারিগরী যা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল হতে পারে না। তাছাড়া এর সাথে এত বেশী যৌক্তিক বিষয় তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট আছে যে, আকস্মিকভাবে এরূপ জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসংগত ব্যবস্থা চালু হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সমুদ্রে অসংখ্য জীবজন্তু সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর প্রত্যেকটি প্রজাতিকে সমুদ্রের যে গভীরতায় বসবাসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার দৈহিক ব্যবস্থাপনাও সেই গভীরতার উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে প্রতিদিন কোটি কোটি জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এসব জীবজন্তুর দেহ যাতে পচে গলে না যায় সে জন্য এর পানি লবণাক্ত বানানো হয়েছে। সমুদ্রের পানি একটি নির্দিষ্ট সীমায় থামিয়ে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করে তা তার অভ্যন্তরে নেমে যায় না কিংবা স্থলভাগে উঠে তা প্লাবিত করে দেয় না। লাখ লাখ ও কোটি কোটি বছর ধরে তা এ সীমার মধ্যেই থেমে আছে। পানির এ বিশাল ভাণ্ডার বহাল থাকার কারণেই পৃথিবীর স্থলভাগে বৃষ্টির ব্যবস্থা হয়। সূর্যের তাপ এবং বায়ু প্রবাহ সম্পূর্ণ নিয়মিতভাবে এ ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। প্রাণীশূন্য না হওয়ার এবং এর মধ্যে নানা রকমের জীবজন্তু সৃষ্টি হওয়ার সুফল হয়েছে এই যে, মানুষ সমুদ্র থেকে ব্যাপক পরিমাণে তার খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় বহু জিনিস লাভ করছে। একটি নির্দিষ্ট সীমায় থেমে থাকার কারণে মহাদেশ ও দ্বীপগুলো টিকে আছে, যেখানে মানুষ বাস করছে।

فَوَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿١١﴾ الَّذِيۡنَ هُمۡ فِيۡ خَوۡضٍ يَّلۡعَبُوۡنَ ﴿١٢﴾ يَوۡمَ يُدَعُّوۡنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيۡ كُنۡتُمۡ بِهَا تُكَذِّبُوۡنَ ﴿١٤﴾ اَفَسِحۡرٌ هٰذَاۤ اَمۡ اَنۡتُمۡ لَا تُبۡصِرُوۡنَ ﴿١٥﴾ اِصۡلَوۡهَا فَاصۡبِرُوۡۤا اَوۡ لَا تَصۡبِرُوۡا ۚ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡ ؕ اِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿١٦﴾

ধ্বংস রয়েছে সেদিন সেসব অস্বীকারকারীদের জন্য যারা আজ তামাসাচ্ছলে নিজেদের যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যস্ত আছে।[৯] যেদিন তাদের ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন তাদের বলা হবে এতো সেই আগুন যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। এখন বলো, এটা কি যাদু না এখনো তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো না?[১০] যাও, এখন এর মধ্যে ঢুকে দগ্ধ হতে থাকো। তোমরা ধৈর্য ধর আর না ধর, এখন উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যেমন কাজ করে এসেছো ঠিক তেমন প্রতিদানই তোমাদের দেয়া হচ্ছে।

তা কতকগুলো অলংঘনীয় নিয়ম মেনে চলার কারণে সেখানে মানুষের জাহাজ চালানো সম্ভব হয়েছে। একজন মহাজ্ঞানীর জ্ঞান ও মহাক্ষমতাধরের ক্ষমতা ছাড়া এ সুব্যবস্থাপনার কল্পনাও করা যেতে পারে না এবং এ ধারণাও পোষণ করা যায় না যে, মানুষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত সমুদ্রের এ সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার যে সম্পর্ক তা আকস্মিক ও এলোপাতাড়িভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এটা যদি এ বিষয়ের অনস্বীকার্য প্রমাণ হয় যে, এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ পৃথিবীর বুকে মানুষকে আবাদ করার জন্য আরো অসংখ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে বিশাল এ লবণাক্ত সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন তাহলে সে ব্যক্তি হবে চরম আহমক, যে মহাজ্ঞানী সেই আল্লাহ থেকে এমন মূর্খতা প্রত্যাশা করে যে, তিনি এ সমুদ্র থেকে মানুষের শস্য ক্ষেতসমূহ সিক্ত করে তার মাধ্যমে মানুষকে রিযিক দানের ব্যবস্থা করে দিবেন কিন্তু কখনো তাকে জিজ্ঞেস করবেন না যে, তুমি আমার রিযিক খেয়ে কিভাবে তার হক আদায় করেছো? তাছাড়া তিনি এ সমুদ্রের বুকে মানুষকে জাহাজ চালানোর ক্ষমতা দেবেন কিন্তু একথা কখনো জিজ্ঞেস করবেন না যে, তুমি ন্যায় ও সত্যের আনুগত্য করে জাহাজ চালিয়েছো না তার সাহায্যে সারা বিশ্বে ডাকাতি করে বেড়িয়েছো? অনুরূপভাবে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতার একটি নগণ্য বিস্ময়কর নমুনা এ বিশাল সমুদ্রের সৃষ্টি, যিনি মহাশূন্যে আবর্তনকারী ঝুলন্ত এ গ্রহ পৃষ্ঠে পানির এত বড় ভাণ্ডার ধরে রেখেছেন, যিনি তার মধ্যে এমন বিশাল পরিমাণ লবণ গুলিয়ে দিয়েছেন, যিনি এর মধ্যে নানা রকমের অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্য থেকেই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন, যিনি প্রতি বছর সেখান থেকে শত শত কোটি টন পানি উঠিয়ে বাতাসের কাঁধে তুলে নিয়ে যান এবং কোটি কোটি বর্গমাইল ব্যাপী শুষ্ক অঞ্চলে নিয়মিতভাবে বর্ষণ করে চলেছেন তাঁর

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَٰكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

মুত্তাকীরা[১১] সেখানে বাগান ও নিয়ামতসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে এবং তাদের রব তাদের যা কিছু দান করবেন তা মজা করে উপভোগ করতে থাকবে। আর তাদের রব তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবেন।[১২] (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যেসব কাজ করে এসেছো তার বিনিময়ে মজা করে পানাহার করো।[১৩]

সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করাও চরম মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয় যে, তিনি মানুষকে একবার সৃষ্টি করার পর এমন অক্ষম হয়ে যান যে, পুনরায় তাকে সৃষ্টি করতে চাইলেও করতে পারেন না।

৭. মূল আয়াতাংশ হলো تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا । আরবী ভাষায় مور আবর্তিত হওয়া, কেঁপে কেঁপে ওঠা, ঘুরপাক খাওয়া এবং বারবার সামনে ও পেছনে চলা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের দিন আসমানের যে অবস্থা হবে একথাটির মাধ্যমে তা বর্ণনা করে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, সেদিন উর্ধজগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কেউ যদি সেদিন আকাশের দিকে তাকায় তবে দেখবে যে, সেই সুশোভিত নকশা বিকৃত হয়ে গিয়েছে যা সবসময় একই রকম দেখা যেতো আর চারদিকে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে।

৮. অন্য কথায় ভূপৃষ্ঠের আকর্ষণ ও বন্ধন পাহাড়কে আটকে রেখেছিল তা শিথিল হয়ে যাবে এবং তা সমূলে উৎপাটিত হয়ে এমনভাবে শূন্যে উড়তে থাকবে যেন মেঘমালা ভেসে বেড়াচ্ছে।

৯. অর্থাৎ তারা নবীর কাছে কিয়ামত, আখেরাত, জান্নাত ও দোযখের কথা শুনে সেগুলোকে হাসির খোরাক বানাচ্ছে এবং এ বিষয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে গভীরভাবে চিন্তা করার পরিবর্তে কেবল বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করছে। আখেরাত নিয়ে তাদের বিতর্কের উদ্দেশ্য এর তাৎপর্য বুঝার প্রচেষ্টা নয়, বরং তা একটি খেলা যা দিয়ে তারা মনোরঞ্জন করে থাকে। কিন্তু এটা তাদের কোন্ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আদৌ কোন উপলব্ধি নেই।

১০. অর্থাৎ দুনিয়াতে রসূল যখন তোমাদেরকে এ জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সাবধান করতেন তখন তোমরা বলতে, এটা কেবল কথার যাদুগিরি। আমাদেরকে এভাবে বোকা বানানো হচ্ছে। এখন বলো তোমাদের সামনে বিদ্যমান এ জাহান্নাম কি সেই যাদুর খেলা, নাকি এখনো বুঝে উঠতে পারনি, যে জাহান্নামের খবর তোমাদের দেয়া হতো তোমরা সে জাহান্নামের মুখোমুখি হয়েছো?

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ وَأَمْدَدْنَٰهُم بِفَٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

তারা সামনাসামনি রাখা সুসজ্জিত আসনসমূহে হেলান দিয়ে বসবে এবং আমি সুনয়না হুরদের তাদের সাথে বিয়ে দেব।[১৪] যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানসহ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আমি তাদের সেসব সন্তানকেও তাদের সাথে (জান্নাতে) একত্রিত করে দেব। আর তাদের আমলের কোন ঘাটতি আমি তাদেরকে দেব না।[১৫] প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জিত কর্মের হাতে জিম্মী রয়েছে।[১৬] আমি তাদেরকে সব রকমের ফল, গোশত[১৭] এবং তাদের মন যা চাইবে তাই প্রচুর পরিমাণে দিতে থাকবো।

১১. অর্থাৎ যারা নবী–রসূলদের দেয়া খবরের ওপর ঈমান এনে দুনিয়ায় থাকতেই নিজেদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছে এবং যেসব ধ্যান–ধারণা ও কাজ–কর্মের কারণে মানুষ জাহান্নামের উপযুক্ত হয়। তা থেকে দূরে অবস্থান করেছে।

১২. কোন ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের কথা বলার পর তাকে দোযখ থেকে বাঁচিয়ে নেয়ার কথা বলার বাহ্যত কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু কুরআন মজীদের কয়েকটি জায়গায় এ দু'টি কথা আলাদা করে বলার কারণ হলো. কোন ব্যক্তির দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়াটাই একটা বিরাট নিয়ামত। "আল্লাহ তাকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন" এ বাণীটি মূলত একটি মহাসত্যের প্রতি ইংগিত। মহাসত্যটি হলো, কোন ব্যক্তির দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়া কেবল আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে সম্ভব। অন্যথায় মানবিক দুর্বলতা প্রত্যেক ব্যক্তির আমলে এমন সব অপূর্ণতার সৃষ্টি করে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর মহানুভবতা দিয়ে তা উপেক্ষা না করেন এবং মুহাসাবা বা হিসেব–নিকেশ নিতে শুরু করেন তাহলে কেউ–ই পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারে না। তাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া আল্লাহর যত বড় নিয়ামত, দোযখ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে নেয়া তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

১৩. এখানে "মজা করে" কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। মানুষ জান্নাতে যা লাভ করবে কোন প্রকার কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়াই তা লাভ করবে। তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া বা ঘাটতি পড়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা সেখানে থাকবে না। সে জন্য মানুষকে কোন খরচও করতে হবে না। তা হুবহু তার আকাংখা ও মনের পছন্দ মত হবে। যত চাইবে এবং যখনই চাইবে সামনে এনে হাজির করা হবে। সেখানে সে মেহমান হিসেবে অবস্থান

করবেন না যে, কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করবে। সে যা কিছু লাভ করবে তা তার অতীত কাজের প্রতিদান হিসেবে এবং নিজের বিগত দিনের উপার্জনের ফল হিসেবে লাভ করবে। ঐ সব বস্তু পানাহারের কারণে কোন রকম রোগের আশংকা থাকবে না। ক্ষুধা নিবারণ এবং জীবন ধারণের জন্য ঐ সব নিয়ামত হবে না, বরং শুধু স্বাদ ও আনন্দ লাভের জন্য হবে। ব্যক্তি তা থেকে যত মজা ও স্বাদ লাভ করতে চাইবে ততই করতে পারবে; তাতে কোন প্রকার বদহজম হবে না। তাছাড়া ঐ সব খাদ্য কোন প্রকার নোংরা বর্জ্য সৃষ্টি করবে না। সুতরাং পৃথিবীতে মজা করে পানাহার করা যে অর্থ বহন করে জান্নাতে মজা করে পানাহার করা তা থেকে অনেক বেশী ব্যাপক ও উন্নত অর্থ বহন করে।

১৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্‌ফাত, টীকা ২৬–২৯; আদ্ দুখান, টীকা ৪২।

১৫. এ বিষয়টি ইতিপূর্বে সূরা রা'দের ২৩ আয়াত এবং সূরা মু'মিনের ৮ আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে। তবে এখানে পূর্বে দু'টি জায়গায় উল্লেখিত সুখবরের চেয়ে অতিরিক্ত একটি বড় সুখবর শোনানো হয়েছে। সূরা রা'দের আয়াতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছিল যে, জান্নাতবাসীদের পিতা–মাতা–সন্তান–সন্ততি এবং স্ত্রীদের মধ্যে যেসব ব্যক্তি নেককার, তারা সবাই তার সাথে জান্নাতে যাবে। আর সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে এ বলে দোয়া করে যে, তাদের সন্তান, স্ত্রী এবং বাপ–দাদার মধ্যে যারা নেক্‌কার তাদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করে দাও। ঐ দু'টি আয়াতের বক্তব্যের চেয়ে অধিক যে কথাটি এখানে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, সন্তান যদি কোন না কোন পর্যায়ের ঈমানসহ তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ঈমান ও আমলের কারণে তার পিতা যে মর্যাদা লাভ করেছে, আমলের দিক দিয়ে ঐ মর্যাদার উপযুক্ত না হলেও সন্তানদেরকে পিতার সাথে একত্রিত করা হবে। এই একত্র হওয়া মাঝে মাঝে গিয়ে সাক্ষাত করার মত হবে না। এ জন্য أَلْحَقْنَا بِهِمْ কথা ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো জান্নাতে তাদেরকে পিতা–মাতার সাথেই রাখা হবে। এ ছাড়া আরো সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, সন্তানদের সাথে একত্রিত করার জন্য পিতা–মাতাদের মর্যাদা হ্রাস করে পদাবনতি করা হবে না। বরং পিতা–মাতাদের সাথে একত্রিত করার জন্য সন্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাদের পদোন্নতি দিয়ে ওপরে উঠানো হবে।

এখানে একথাটিও বুঝে নিতে হবে যে, নিজ ইচ্ছায় ও সংকল্পে ঈমান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নেক্‌কার মুরুব্বীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে এ বাণী তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু কোন ঈমানদার ব্যক্তির সন্তান যদি ভাল মন্দ উপলব্ধি করার মত বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের ব্যাপারে কুফরী ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাদের তো এমনিতেই জান্নাতে যাওয়ার কথা এবং তাদের পিতা–মাতার চোখ জুড়ানোর জন্য তাদের সাথে একত্রে রাখার কথা।

১৬. এখানে "জিম্মী বা বন্ধক" শব্দটির রূপক ব্যবহার অত্যন্ত অর্থবহ। কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কিছু ঋণ দেয় এবং ঋণদাতা তার পাওনা আদায়ের নিশ্চয়তা হিসেবে ঋণ গ্রহীতার কোন জিনিস নিজের কাছে বন্ধক রাখে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঋণ পরিশোধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধকী বস্তু মুক্ত হবে না। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার

পরও যদি বন্ধকী বস্তু মুক্ত না করে তাহলে বন্ধকী বস্তুটি বাজেয়াপ্ত বা হাতছাড়া হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাও মানুষের মধ্যকার লেনদেনের বিষয়টিকে এখানে বন্ধকী লেনদেনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে যে সাজ–সরঞ্জাম, যেসব শক্তি, যেসব যোগ্যতা এবং যেসব ইখতিয়ার দিয়েছেন তা যেন মালিক তার বান্দাকে ঋণ দিয়েছেন। এ ঋণের জামানত হিসেবে বান্দা নিজেই আল্লাহর কাছে বন্ধক বা জিম্মী হয়ে রয়েছে। বান্দা যদি এসব সাজ–সরঞ্জাম, শক্তি এবং ইখতিয়ার সঠিকভাবে ব্যবহার করে নেকী অর্জন করে—যে নেকী দ্বারা এসব ঋণ পরিশোধ হবে, তাহলে সে বন্ধকী মাল অর্থাৎ নিজেকে মুক্ত করে নেবে। অন্যথায় তা বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হবে। পূর্ববর্তী আয়াতের পরপরই একথা বলার কারণ হচ্ছে, সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ যত বড় মর্যাদা সম্পন্নই হোক না কেন তাদের সন্তানরা নিজেদের কর্ম দ্বারা নিজেদের সত্তাকে মুক্ত না করলে তাদের বন্ধক মুক্তি হতে পারে না। বাপ–দাদার কর্ম সন্তানদের মুক্ত করতে পারে না। তবে সন্তানরা যদি যে কোন মাত্রার ঈমান ও সৎকর্মশীলদের আনুগত্য দ্বারা নিজেরা নিজেদের মুক্ত করতে পারে তাহলে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাদেরকে নিম্ন মর্যাদা থেকে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে বাপ–দাদার সাথে একত্রিত করে দেবেন। এটা নিছক আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী ও দয়া। সন্তানরা বাপ–দাদার সৎকাজের এ সুফলটুকু অন্তত লাভ করতে পারে। তবে তারা যদি নিজেদের কর্মদ্বারা নিজেরাই নিজেদেরকে দোযখের উপযোগী বানায় তাহলে এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, বাপ–দাদার কারণে তাদেরকে জান্নাতে পৌছিয়ে দেয়া হবে। সাথে সাথে এ আয়াত থেকে একথাও বুঝা যায় যে, নিম্ন মর্যাদার নেক সন্তানদের নিয়ে উচ্চ মর্যাদার নেক পিতা–মাতার সাথে একত্রিত করে দেয়া প্রকৃতপক্ষে সেসব সন্তানের কর্মের ফল নয়, বরং তা ঐসব পিতা–মাতার কর্মের ফল। তারা নিজেদের আমল দ্বারা এ মর্যাদা লাভের উপযুক্ত হবে। তাই তাদের মন খুশী করার জন্য সন্তানদেরকেও তাদের সাথে একত্রিত করা হবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা হ্রাস করে তাদেরকে তাদের সন্তানদের কাছে নিয়ে যাবেন না। বরং সন্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাদের কাছে নিয়ে যাবেন; যাতে নিজ সন্তানদের থেকে দূরে অবস্থানের কারণে মনকষ্ট না হয় এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দেয়ার ক্ষেত্রে এ কমতিটুকু না থেকে যায়।

১৭. এ আয়াতটিতে জান্নাতবাসীদেরকে সব রকমের গোশত সরবরাহ করার কথা উল্লেখ আছে। আর সূরা ওয়াকিয়ার ২১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে পাখীর গোশত দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে। এ গোশত কি প্রকৃতির হবে তা আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু কুরআনের কোন কোন আয়াতে এবং কোন কোন হাদীসে জান্নাতের দুধ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা জীব–জন্তুর পালান থেকে নির্গত হবে না। জান্নাতের মধু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা মৌমাছির মধু হবে না। আর জান্নাতের শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা ফল পচিয়ে তার নির্যাসে তৈরী হবে না। আল্লাহর কুদরতে এগুলো ঝর্ণাসমূহ থেকে নির্গত হবে এবং নদীতে প্রবাহিত হবে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, জান্নাতের গোশতও জবাইকৃত জীব–জন্তুর গোশত হবে না, বরং কুদরতি পন্থায় তৈরী হবে। যে আল্লাহ মাটির উপাদানসমূহ থেকে সরাসরি দুধ, মধু ও শরাব তৈরী করতে সক্ষম, তিনি এসব উপাদান দিয়েই জীব–জন্তুর গোশতের চেয়েও অধিক সুস্বাদ গোশত তৈরী করে দিতে পারেন। এটা

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

তারা সেখানে পরস্পরের নিকট থেকে ক্ষিপ্রতার সাথে শরাব পাত্র গ্রহণ করতে থাকবে। কিন্তু সেখানে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা থাকবে না এবং থাকবে না কোন চরিত্রহীনতা।[১৮] তাদের সেবার জন্য সেসব বালকেরা ছুটাছুটি করতে থাকবে যারা কেবল তাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে[১৯] তারা এমন সুদর্শন যেন সযত্নে লুকিয়ে রাখা মোতি। তারা একে অপরকে (পৃথিবীতে অতিবাহিত) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তারা বলবে আমরা প্রথমে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করতাম।[২০] পরিশেষে আল্লাহ আমাদের ওপর মেহেরবানী করেছেন এবং দগ্ধকারী[২১] আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। অতীত জীবনে আমরা তাঁর কাছেই দোয়া করতাম সত্যিই তিনি অতি বড় উপকারী ও দয়াবান।

তাঁর ক্ষমতার অসাধ্য নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাত টীকা ২৫; সূরা মুহাম্মাদ, টীকা ২১ থেকে ২৩)।

১৮. অর্থাৎ সেই শরাব নেশা সৃষ্টিকারী হবে না। তাই তা পান করে কেউ মাতাল হয়ে বেহুদা ও আবোলতাবোল বকবে না, গালি-গালাজ করবে না, চড় থাপ্পড় দেবে না কিংবা দুনিয়ার শরাব পানকারীদের মত অশ্লীল ও অশালীন আচরণ করবে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাত, টীকা ২৭)।

১৯. এ সূক্ষ্ম বিষয়টি বিশেষ লক্ষণীয় যে, غِلْمَانُهُمْ বলা হয়নি, বরং غِلْمَانٌ لَّهُمْ বলা হয়েছে। যদি غِلْمَانُهُمْ বলা হতো তাহলে তা থেকে এ ধারণা করা যেতে পারতো যে, দুনিয়ায় যারা তাদের খাদেম ছিল জান্নাতেও তাদেরকেই তাদের খাদেম বানিয়ে দেয়া হবে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে দুনিয়ার যে ব্যক্তিই জান্নাতে যাবে সে তার উপযুক্ত পাত্র হিসেবেই যাবে এবং দুনিয়ায় সে যে প্রভুর খেদমত করতো বেহেশতেও তাকে সেই প্রভুর খাদেম বানিয়ে দেয়া হবে তার কোন কারণ নেই। বরং এমনও হতে পারে যে, কোন খাদেম তার নেক আমলের কারণে জান্নাতে প্রভুর চেয়েও উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। সুতরাং غِلْمَانٌ لَّهُمْ বলে এ ধারণা পোষণের কোন অবকাশই রাখা হয়নি। এ শব্দটি

فَذَكِّرْ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ
شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ
الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ
تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهٖٓ إِنْ كَانُوا
صٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾

২ রুকূ'

তাই হে নবী (সা), তুমি উপদেশ দিতে থাক। আল্লাহর মেহেরবাণীতে তুমি গণকও নও, পাগলও নও।[২২]

এসব লোক কি বলে যে, এ ব্যক্তি কবি, যার ব্যাপারে আমরা কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছি।[২৩] তাদেরকে বলো, ঠিক আছে অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।[২৪] তাদের বিবেক–বুদ্ধি কি তাদেরকে এসব কথা বলতে প্ররোচিত করে, না কি প্রকৃতপক্ষে তারা শত্রুতায় সীমালংঘনকারী লোক?[২৫]

তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই কুরআন রচনা করে নিয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তারা ঈমান গ্রহণ করতে চায় না।[২৬] তাদের একথার ব্যাপারে তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এ বাণীর মত একটি বাণী তৈরী করে আনুক।[২৭]

এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয় যে, এরা হবে সেই সব বালক যাদেরকে জান্নাতে তাদের খেদমতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাত, টীকা ২৬)।

২০. অর্থাৎ আমরা সেখানে বিলাসিতায় ডুবে এবং আপন ভূবনে মগ্ন থেকে গাফলতির জীবন যাপন করিনি। সেখানে সবসময়ই আমাদের আশংকা থাকতো যে, কখন যেন আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ হয়ে যায়, যে কারণে আল্লাহ আমাদের পাকড়াও করবেন। এখানে বিশেষ করে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করার উল্লেখ করার কারণ এই যে, মানুষ বেশীর ভাগ যে জন্য গোনাহে লিপ্ত হয় তা হচ্ছে তার সন্তান–সন্ততির আরাম–আয়েসের ব্যবস্থা করা এবং তাদের দুনিয়া নির্মাণের চিন্তা। এ জন্য সে হারাম উপার্জন করে, অন্যদের অধিকার লুণ্ঠন করে এবং নানা রকম অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। এ কারণে জান্নাতের বাসিন্দারা পরস্পর বলবে বিশেষভাবে যে জিনিসটি

আমাদেরকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করেছে তা হচ্ছে, নিজের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে জীবন যাপন করতে গিয়ে তাদের আরাম-আয়েশে রাখার এবং তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার ততটা চিন্তা ছিল না যতটা চিন্তা ছিল এ ব্যাপারে যে, তাদের জন্য আমরা যেন এমন পন্থা অবলম্বন করে না বসি, যার দ্বারা আমাদের আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে, আর নিজের সন্তানদেরকেও আমরা এমন পথে নিয়ে যাবো যা তাদেরকে আল্লাহর আযাবের উপযোগী বানিয়ে দেবে।

২১. মূল আয়াত سَمُوْم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ চরম উষ্ণ হাওয়া। অর্থাৎ দোযখ থেকে উত্থিত উত্তপ্ত হাওয়ার ঝাপটা।

২২. মক্কার কাফেররা জুলুম ও হঠকারিতার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলা করছিল। ওপরে আখেরাতের চিত্র পেশ করার পর এখন বক্তব্যের মোড় এখানে তাদের জুলুম ও হঠকারিতার দিকে ঘুরে যাচ্ছে। এখানে বাহ্যতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকেই এসব কথা শুনানো হচ্ছে। তিনি যখন তাদের সামনে কিয়ামত, হাশর-নাশর, হিসেব-নিকেশ, শাস্তি ও পুরস্কার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলতেন আর এসব বিষয় সম্বলিত কুরআন মজীদের আয়াত শুনিয়ে দাবী করতেন, এসব খবর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে এসেছে, এ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে এ বাণী নাযিল করেছেন তখন তাদের নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় পুরোহিত গোষ্ঠী এবং তাদের বখাটে লোকেরা তাঁর এ বক্তব্য যেমন কখনো সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে-চিন্তে দেখতো না, তেমনি এও চাইতো না যে, জনসাধারণ তাঁর বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দিক। তাই তারা কখনো বলতো তিনি গণক, কখনো বলতো তিনি পাগল, কখনো বলতো তিনি কবি, আবার কখনো বলতো তিনি নিজেই এসব অদ্ভুত কথা রচনা করেন এবং নিজের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত অহী বলে পেশ করেন। তাদের ধারণা ছিল, এভাবে অপবাদ আরোপ করে মানুষের মনে তাঁর ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দিতে পারবে এবং তাঁর সব কথা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং এখানে বলা হচ্ছে, হে নবী, বাস্তব অবস্থা তো তাই যা সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এসব কারণে এসব লোক যদি তোমাকে গণক এবং পাগল বলে তাহলে তার পরোয়া করো না। আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের গাফলতি সম্পর্কে সতর্ক এবং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সাবধান করার কাজ করতে থাকো। কারণ, আল্লাহর মেহেরবানীতে তুমি গণকও নও, পাগলও নও।

আরবী ভাষায় كَاهِن শব্দটি জোতিষী, ভবিষ্যৎ বক্তা ও জ্ঞানবান অর্থে ব্যবহৃত হয়। জাহেলী যুগে এটি একটি স্বতন্ত্র পেশা ছিল। গণকরা দাবী করতো এবং দুর্বল আকীদার লোকেরা মনে করতো যে, তারা নক্ষত্র বিশারদ বা আত্মা, শয়তান ও জিনদের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে, যার মাধ্যমে তারা গায়েবী খবর জানতে পারে। কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তা কোথায় পড়ে আছে তা তারা বলে দিতে পারে। কারো বাড়ীতে চুরি হলে কে চোর তা তারা বলে দিতে পারে। কেউ তার ভাগ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলে দিতে পারে তার ভাগ্যে কি লেখা আছে। মানুষ এসব উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের কাছে যেতো। তারা কিছু নযর-নিয়াজ নিয়ে তাদেরকে গায়েবী কথা বলে দিতো। মানুষ যাতে তাদের

কাছে আসে এ উদ্দেশ্যে তারা নিজেরাও অনেক সময় বস্তিতে গিয়ে হাঁক ছেড়ে বেড়াতো। তাদের একটা বিশেষ ঢং হতো, যা দিয়ে তাদের চেনা যেতো। তাদের কথাবার্তাও সাধারণ বোলচাল থেকে ভিন্ন হতো। তারা বিশেষ ভংগীতে কিছুটা গানের সুরে ছন্দবদ্ধ কথা বলতো এবং সাধারণত এমন হেঁয়ালিপূর্ণ কথা বলতো যা থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মনের কথার সন্ধান করে নিতে পারে। জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কুরাইশ নেতারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তারা গণক হওয়ার অপবাদ আরোপ করেছিল। আর তা করেছিল শুধু এ কারণে যে, তিনি এমন সব বিষয়ে কথা বলতেন যা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে ছিল, তাছাড়া তিনি দাবী করতেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা এসে তাঁর কাছে অহী নাযিল করে এবং আল্লাহর যে বাণী তিনি পেশ করেন তাও ছিল ছন্দায়িত। কিন্তু তাদের এ অপবাদের কারণে আরবের কোন মানুষই প্রতারিত হয়নি। কারণ গণকদের পেশা, তাদের চালচলন, তাদের কথাবার্তা এবং তাদের কারবার কারোই অজানা ছিল না। সবাই জানতো, তারা কি কাজ করে, কি উদ্দেশ্যে লোকজন তাদের কাছে যায়, কি কি কথা তারা তাদেরকে বলে, তাদের ছন্দবদ্ধ কথাগুলো কেমন হয় এবং তার বিষয়বস্তু কি থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এটা আদৌ কোন গণকের কাজ হতে পারে না যে, জাতির মধ্যে তৎকালে প্রচলিত আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী আকীদা-বিশ্বাস সে তুলে ধরবে, দিনরাত তার প্রচার প্রসারে জীবনপাত করবে এবং সে জন্য গোটা জাতির শত্রুতার ঝুঁকি নেবে। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গণক হওয়ার এ অপবাদের নাম মাত্র সামঞ্জস্যও ছিল না। তাই নবীর (সা) ওপর এ অপবাদ আরোপ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুতরাং আরবের কোন নিরেট বোকা লোকও এতে প্রতারিত হয়নি।

অনুরূপভাবে মক্কার কাফেররা নিছক তাদের মনের সান্ত্বনার জন্য নবীকে (সা) পাগল হওয়ার অপবাদ দিতো। যেমন বর্তমান যুগের কোন কোন বেশরম পাশ্চাত্য লেখক ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের হিংসা চরিতার্থ করার জন্য দাবী করে যে, নবীর (সা) ওপর মৃগি রোগের (Epilepsy) আক্রমণ হতো এবং আক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে যেসব কথা বের হতো লোকে তাকেই অহী মনে করতো। সে যুগের কোন জ্ঞানী লোকও এসব বেহুদা অপবাদকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনি, এ যুগের কোন মানুষও কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে সাধিত বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ দেখে একথা বিশ্বাস করতে পারে না যে, এসব কিছু মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফল।

২৩. অর্থাৎ এ ব্যক্তির ওপর কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হোক এবং আমরা তার জ্বালাতন থেকে রক্ষা পাই, এ জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। সম্ভবত তাদের ধারণা ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আমাদের উপাস্যদের বিরোধিতা এবং তাদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড অবিশ্বাস করেন, তাই হয় তাঁর ওপরে আমাদের কোন উপাস্য দেব-দেবীর কোপানল পড়বে অথবা কোন দুঃসাহসী বীর তার এসব কথা শুনে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে এবং তাকে হত্যা করবে।

২৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, আমিও দেখছি তোমাদের এ আকাংখা পূরণ হয় কিনা। অপর অর্থটি হচ্ছে, দুর্ভাগ্য আমার আসে না তোমাদের আসে, তা দেখার জন্য আমিও অপেক্ষা করছি।

২৫. এ দু'টি বাক্যে বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচার খণ্ডন করে দিয়ে তাদের মুখোশ সম্পূর্ণরূপে খুলে দেয়া হয়েছে। যুক্তির সারকথা হলো, কুরাইশদের এসব নেতা ও প্রবীণ ব্যক্তি বড় বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সেজে বসে আছে। কিন্তু তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কি বলে, যে ব্যক্তি কবি নয় তাকে কবি বলো, গোটা জাতির লোক যাকে একজন জ্ঞানী বলে জানে তাকে পাগল বলো এবং গণনা বিদ্যার সাথে যার দূরতম সম্পর্কও নেই তাকে অযথা গণক বলে আখ্যায়িত করো। এরপরও যদি তারা জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত নিতো তাহলে যে কোন একটি কথাই বলতো। অনেকগুলো পরস্পর বিরোধী উপাধি তো কাউকে একসাথে দেয়া যায় না। এক ব্যক্তি কবি, পাগল ও গণক একই সাথে কিভাবে হতে পারে? সে যদি পাগল হয়ে থাকে তাহলে গণক বা কবি হতে পারে না। গণক হলে কবি হতে পারে না এবং কবি হলে গণক হতে পারে না। কেননা, কবিতার ভাষা ও আলোচ্য বিষয় যা গণক বা জোতিষীদের ভাষা ও বিষয়বস্তু তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই কথাকে যুগপৎ কাব্য ও গণকদের গণনা বলে আখ্যায়িত করা এমন কোন ব্যক্তির কাজ হতে পারে না, যে কাব্য ও গণনা বিদ্যার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত। অতএব, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার কথা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে পরস্পর বিরোধী কথা ও মন্তব্য জ্ঞান-বুদ্ধির ভিত্তিতে নয়, বরং সরাসরি জিদ ও হঠকারিতার ভিত্তিতে করা হচ্ছে। জাতির এসব বড় বড় নেতা শুধু শত্রুতার আতিশয্যে অন্ধ হয়ে এমন সব ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করছে যা কোন সুস্থ ও স্থির মস্তিষ্কের মানুষ গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারে না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, টীকা ১০৪; ইউনুস, টীকা ৩; বানী ইসরাঈল, টীকা ৫৩, ৫৪; আশ শু'আরা, টীকা ১৩০, ১৩১, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪)

২৬. অন্য কথায় এ উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, কুরাইশদের মধ্যে যেসব লোক বলতো, কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচিত বাণী তারাও জানতো যে, এটা তাঁর বাণী হতে পারে না। তাছাড়া অন্য যেসব লোকের ভাষা আরবী, তারা এ বাণী শোনা মাত্র পরিষ্কার বুঝে ফেলতো যে, এটা মানুষের কথার চেয়ে অনেক উর্ধের জিনিসই শুধু নয়, বরং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানতো সে কখনো ধারণাই করতে পারতো না যে, এটা সত্যিই তাঁর নিজের কথা। অতএব, পরিষ্কার ও সোজা কথা হলো, কুরআনকে তাঁর নিজের রচনা বলে আখ্যা দানকারীরা আসলে ঈমান আনতে চায় না। তাই তারা নানা রকমের মিথ্যা বাহানা খাড়া করছে। আর এটি সেসব বাহানারই একটি। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ইউনুস, টীকা ২১; আল ফুরকান, টীকা ১২; আল কাসাস, টীকা ৬৪; আল আনকাবূত, টীকা ৮৮-৮৯; আস সাজদা, টীকা ১ থেকে ৪; হা-মীম আস সাজদা, টীকা ৫৪; আল আহকাফ, টীকা ৮ থেকে ১০)

২৭. অর্থাৎ কথা শুধু এ টুকু নয় যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নয়, বরং এটা আদৌ মানুষের কথা নয়। এ রকম বাণী রচনা করাও মানুষের সাধ্যাতীত। তোমরা যদি একে মানুষের কথা বলতে চাও তাহলে মানুষের রচিত এ মানের কোন কথা এনে প্রমাণ করো। শুধু কুরাইশদেরকে নয়, সারা দুনিয়ার মানুষকে এ আয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। এরপর পুনরায় মক্কায়

তিনবার এবং মদীনায় শেষ বারের মত এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। (দেখুন ইউনুস, আয়াত ৩৮; হূদ, ১৩; বনী ইসরাঈল, ৮৮; আল বাকারা, ২৩)। কিন্তু সে সময়ও কেউ এর জবাব দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। তার পরেও আজ পর্যন্ত কেউ কুরআনের মোকাবিলায় মানুষের রচিত কোন কিছু পেশ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। কেউ কেউ এ চ্যালেঞ্জের প্রকৃত ধরন না বুঝার কারণে বলে থাকে, শুধু কুরআন কেন, কোন একক ব্যক্তির নিজস্ব রীতিতেও অন্য কেউ গদ্য বা কবিতা লিখতে সমর্থ হয় না। হোমার, রুমী, সেক্সপিয়ার, গেটে, গালিব, ঠাকুর, ইকবাল সবাই এদিক দিয়ে অনুপম যে তাদের অনুকরণ করে তাদের মত কথা রচনা করার সাধ্য কারোই নেই। কুরআনের চ্যালেঞ্জের এ জবাবদাতারা প্রকৃতপক্ষে এ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে যে, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ আয়াতাংশের অর্থ হুবহু কুরআনের মতই কোন গ্রন্থ রচনা করে দেয়া। অথচ এর অর্থ বাকরীতির দিক দিয়ে সমমান নয়। এর অর্থ সামগ্রিকভাবে এর গুরুত্ব ও মর্যাদার সমপর্যায়ের কোন গ্রন্থ নিয়ে এসো। যেসব বৈশিষ্টের কারণে কুরআন একটি মু'জিযা ঐ গ্রন্থও সে একই রকম বৈশিষ্ট মণ্ডিত সমপর্যায়ের হতে হবে। যেসব বড় বড় বৈশিষ্টের কারণে কুরআন পূর্বেও মু'জিযা ছিল এবং এখনো মু'জিযা তার কয়েকটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ যে ভাষায় কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে তা সে ভাষার সাহিত্যের উচ্চতম ও পূর্ণাঙ্গ নমুনা। গোটা গ্রন্থের একটি শব্দ বা একটি বাক্যও মানের নিচে নয়। যে বিষয়টিই ব্যক্ত করা হয়েছে সেটিই উপযুক্ত শব্দ ও উপযুক্ত বাচনভংগীতে বর্ণনা করা হয়েছে। একই বিষয় বার বার বর্ণিত হয়েছে এবং প্রতিবারই বর্ণনার নতুন ভংগী গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু সেজন্য পৌনপুনিকতার দৃষ্টিকটূতা ও শ্রুতিকটূতা কোথাও সৃষ্টি হয়নি। গোটা গ্রন্থে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দের গাঁথুনি এমন যেন আংটির মূল্যবান পাথরগুলো ছেঁটে ছেঁটে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কথা এতটা মর্মস্পর্শী যে, তা শুনে ভাষাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই মাথা নিচু না করে থাকতে পারে না। এমন কি অমান্যকারী এবং বিরোধী ব্যক্তির মনপ্রাণ ও ভাবাবেগ পর্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ১৪ শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আজ অবধি এ গ্রন্থ তার ভাষায় সাহিত্যের সবচেয়ে উন্নত নমুনা। এর সমপর্যায়ের তো দূরের কথা সাহিত্যিক মর্যাদা ও মূল্যমানে আরবী ভাষার কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত এর ধারে কাছেও পৌছেনি। শুধু তাই নয়, এ গ্রন্থ আরবী ভাষাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে বসেছে যে, ১৪ শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ ভাষার বিশুদ্ধতার মান তাই আছে যা এ গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। অথচ এ সময়ের মধ্যে ভাষাসমূহ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। পৃথিবীতে আর কোন ভাষা এমন নেই যা এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লিখন পদ্ধতি, রচনা রীতি, বাচনভংগী, ভাষার নিয়ম–কানুন এবং শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একই রূপ নিয়ে টিকে আছে। কিন্তু এটা শুধু কুরআনের শক্তি যা আরবী ভাষাকে স্থানচ্যুত হতে দেয়নি। আজ পর্যন্ত এর একটি শব্দও পরিত্যক্ত হয়নি। এর প্রতিটি বাকরীতি অদ্যাবধি আরবী ভাষায় প্রচলিত আছে। এর সাহিত্যমান আজ পর্যন্ত আরবী ভাষার উচ্চ মানের সাহিত্য। ১৪ শত বছর আগে কুরআনে যে বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল বক্তৃতা ও লেখায় আজও সেটাই বিশুদ্ধ ভাষা বলে মানা হচ্ছে। দুনিয়ার কোন ভাষায় মানুষের রচিত কোন গ্রন্থ কি এ মর্যাদা লাভ করেছে!

দুই ঃ এটা পৃথিবীর একমাত্র গ্রন্থ যা মানব জাতির ধ্যান-ধারণা, স্বভাব-চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জীবন প্রণালীর ওপর এমন ব্যাপক, এমন গভীর এবং এমন সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে যে, পৃথিবীতে তার কোন নজির পাওয়া যায় না। এর প্রভাব প্রথমে একটি জাতির মধ্যে পরিবর্তন আনলো। অতপর সেই জাতি তৎপর হয়ে পৃথিবীর একটি বিশাল অংশে পরিবর্তন আনলো। দ্বিতীয় আর কোন গ্রন্থ নেই যা এতটা বিপ্লবাত্মক প্রমাণিত হয়েছে। এ গ্রন্থ কেবলমাত্র কাগজের পৃষ্ঠাসমূহেই লিপিবদ্ধ থাকেনি বরং তার এক একটি শব্দ ধ্যান-ধারণাকে বাস্তবে রূপদান করেছে এবং একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা নির্মাণ করেছে। ১৪ শত বছর ধরে তার এ প্রভাব চলে আসছে এবং দিনে দিনে তা আরো বিস্তৃত হচ্ছে।

তিন ঃ এ গ্রন্থ যে বিষয়ে আলোচনা করে তা একটি ব্যাপকতর বিষয়। এর পরিধি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত গোটা বিশ্ব-জাহানকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। এ গ্রন্থ বিশ্ব-জাহানের তাৎপর্য তার শুরু ও শেষ এবং তার নিয়ম-শৃংখলা সম্পর্কে বক্তব্য ও মত পেশ করে। এ গ্রন্থ বলে দেয় এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, শৃংখলাবিধানকারী এবং পরিচালক কে? কি তাঁর গুণাবলী, কি তাঁর ইখতিয়ার ও ক্ষমতা এবং কি সেই মূল ও আসল বিষয় যার ভিত্তিতে তিনি এ গোটা বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে বলে দেয় যে, এটা তার স্বাভাবিক অবস্থান এবং এটা তার জন্মগত মর্যাদা। সে এ অবস্থান ও মর্যাদা পাল্টে দিতে সক্ষম নয়। এ অবস্থান ও মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের জন্য সত্য ও বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল সঠিক পথ কি এবং সত্য ও বাস্তবের সাথে সংঘাতপূর্ণ ভ্রান্ত পথ কি তা সে বলে দেয়। সঠিক পথের সঠিক হওয়া এবং ভ্রান্ত পথের ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণের জন্য সে যমীন ও আসমানের এক একটি বস্তু থেকে, মহাবিশ্ব ব্যবস্থার এক একটি প্রান্ত থেকে মানুষের নিজের আত্মা ও সত্তা থেকে এবং মানুষেরই নিজের ইতিহাস থেকে অসংখ্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে। এর সাথে সে বলে দেয় মানুষ কিভাবে ও কি কি কারণে ভ্রান্ত পথে চলেছে এবং প্রতি যুগে তাকে কিভাবে সঠিক পথ বাতলে দেয়া হয়েছে যা সবসময় একই ছিল এবং একই থাকবে। সে কেবল সঠিক পথ দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় না। বরং সে পথে চলার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার চিত্র পেশ করে যার মধ্যে আকায়েদ, আখলাক, আত্মার পরিশুদ্ধি, ইবাদাত-বন্দেগী, সামাজিকতা, তাহযীব, তামাদ্দুন, অর্থনীতি, রাজনীতি, ন্যায়বিচার, আইন-কানুন—এক কথায় মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া এ সঠিক পথ অনুসরণ করার এবং ভ্রান্ত পথসমূহে চলার কি কি ফলাফল এ দুনিয়ায় দেখা দেবে এবং দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার পর অন্য আরেকটি জগতে দেখা দেবে তাও সে বিস্তারিত বলে দেয়। সে এ দুনিয়ার পরিসমাপ্তি এবং আরেকটি দুনিয়া প্রতিষ্ঠার অবস্থা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে; এ পরিবর্তনের সমস্ত স্তর এক এক করে বলে দেয়, দৃষ্টির সামনে পরজগতের পূর্ণ চিত্র অংকন করে এবং সেখানে মানুষ কিভাবে আরেকটি জীবন লাভ করবে তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করে, কিভাবে তার পার্থিব জীবনের কার্যাবলীর হিসেব-নিকেশ হবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কেন অনস্বীকার্য রূপে তার সামনে তার আমলনামা পেশ করা হবে। সেসব কাজের প্রমাণ স্বরূপ কি ধরনের অকাট্য সাক্ষসমূহ পেশ করা হবে, পুরস্কার ও শাস্তিলাভকারী কেন পুরস্কার ও শাস্তিলাভ

করবে। পুরস্কার লাভকারীরা কি ধরনের পুরস্কারলাভ করবে এবং শাস্তি প্রাপ্তরা কি কি ভাবে তাদের কার্যাবলীর মন্দফল ভোগ করবে, এ ব্যাপক বিষয়ে যে বক্তব্য এ গ্রন্থে পেশ করা হয়েছে তার মর্যাদা এমন নয় যে, তার রচয়িতা তর্ক শাস্ত্রের কিছু যুক্তিতর্ক একত্রিত করে কতকগুলো অনুমানের প্রাসাদ নির্মাণ করছেন, বরং এর রচয়িতা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান রাখেন, তাঁর দৃষ্টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু দেখছে। সমস্ত সত্য তাঁর কাছে উন্মুক্ত। মহাবিশ্বের গোটাটাই তাঁর কাছে একখানা উন্মুক্ত গ্রন্থের মত। মানব জাতির শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই শুধু নয়। লয় প্রাপ্তির পর তার অপর জীবনও তিনি যুগপৎ এক দৃষ্টিতে দেখছেন এবং শুধু অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে নয়, জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষকে পথপ্রদর্শন করছেন। এ গ্রন্থ যেসব সত্যকে তাত্বিকভাবে পেশ করে থাকে আজ পর্যন্ত তার কোন একটিকে ভূল বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়নি। বিশ্ব–জাহান ও মানুষ সম্পর্কে সে যে ধারণা পেশ করে তা সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু ও ঘটনাবলীর পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা পেশ করে এবং জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় গবেষণার ভিত্তি রচনা করে। দর্শন বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের সমস্ত সাম্প্রতিকতম প্রশ্নের জবাব তার বাণীতে বর্তমান এবং এসবের মধ্যে এমন একটা যৌক্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান যে, ঐগুলোকে ভিত্তি করে একটি পূর্ণাংগ সুসংবদ্ধ ও ব্যাপক চিন্তাপদ্ধতি গড়ে ওঠে। তাছাড়া জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে সে মানুষকে যে বাস্তব পথনির্দেশনা দিয়েছে তা শুধু যে, সর্বোচ্চ মানের যুক্তিগ্রাহ্য ও অত্যন্ত পবিত্র তাই নয়। বরং ১৪ শত বছর ধরে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন আনাচে কানাচে অসংখ্য মানুষ কার্যত তার অনুসরণ করছে। আর অভিজ্ঞতা তাকে সর্বোত্তম ব্যবস্থা বলে প্রমাণিত করেছে। এরূপ মর্যাদার মানব রচিত কোন গ্রন্থ কি দুনিয়ায় আছে কিংবা কোন সময় ছিল, যা এ গ্রন্থের মোকাবিলায় এনে দাঁড় করানো যেতে পারে?

চার ঃ এ গ্রন্থ পুরোটা একবারে লিখে দুনিয়ার সামনে পেশ করা হয়নি। বরং কতগুলো প্রাথমিক নির্দেশনা নিয়ে একটি সংস্কার আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল। এরপর ২৩ বছর পর্যন্ত উক্ত আন্দোলন যেসব স্তর অতিক্রম করেছে তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে ঐ আন্দোলনের নেতার মুখ দিয়ে এর বিভিন্ন অংশ কখনো দীর্ঘ ভাষণ এবং কখনো সংক্ষিপ্ত বাক্যের আকারে উচ্চারিত হয়েছে। অতপর এ কার্যক্রম পূর্ণতালাভের পর বিভিন্ন সময়ে মুখ থেকে উচ্চারিত এসব অংশ পূর্ণাংগ গ্রন্থের আকারে সাজিয়ে দুনিয়ার সামনে পেশ করা হয়েছে যাকে 'কুরআন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আন্দোলনের নেতার বক্তব্য হলো, এসব ভাষণ ও বাক্য তাঁর রচিত নয়, বরং তা বিশ্ব–জাহানের রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে নাযিল হয়েছে। কেউ যদি একে ঐ নেতার নিজের রচিত বলে অভিহিত করে, তাহলে সে দুনিয়ার গোটা ইতিহাস থেকে এমন একটি নজির পেশ করুক যে, কোন মানুষ বছরের পর বছর নিজে একাধারে একটি বড় সংঘবদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কখনো একজন বক্তা এবং কখনো একজন নৈতিক শিক্ষক হিসেবে, কখনো একটি মজলুম দলের নেতা হিসেবে, কখনো একটি রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে, কখনো একটি যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে, কখনো একজন বিজয়ী হিসেবে, কখনো আইন ও বিধান দাতা হিসেবে মোটকথা অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ–পরিস্থিতি ও সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে ভিন্ন ভিন্ন যেসব বক্তব্য পেশ করেছেন, কিংবা কথা বলেছেন, তা একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণাংগ, সুসংবদ্ধ ও সর্বাত্মক চিন্তা ও কর্মপ্রণালীতে পরিণত হয়েছে এবং তার মধ্যে কোথাও কোন বৈপরীত্য পাওয়া যায় না, তার মধ্যে প্রথম

থেকে শেষ পর্যন্ত একটিই মাত্র কেন্দ্রীয় ধারণা ও চিন্তার ধারাবাহিকতা সক্রিয় দেখা যায়। প্রথম দিন থেকে তিনি তাঁর আন্দোলনের যে ভিত্তি বর্ণনা করেছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত সে ভিত্তি অনুসারে আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যাবলীর এমন একটি ব্যাপক ও সার্বজনীন আদর্শ নির্মাণ করেছেন যার প্রতিটি অংশ অন্যান্য অংশের সাথে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য রাখে এবং এ সংকলন অধ্যয়নকারী কোন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিই একথা উপলব্ধি না করে পারবে না যে আন্দোলনের সূচনাকালে আন্দোলনকারীর সামনে আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত গোটা অন্দোলনের পূর্ণাংগ চিত্র বর্তমান ছিল। এমন কখনো হয়নি মধ্য পথে কোন স্থানে তাঁর মাথায় এমন কোন ধারণার উদ্ভব হয়েছে যা পূর্বে তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল না অথবা যা পরে পরিবর্তন করতে হয়েছে। মস্তিষ্কের সৃষ্টিশীলতার এমন চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হয়েছে এমন কোন মানুষ যদি কোন সময় জন্মগ্রহণ করে থাকে তাহলে তা দেখিয়ে দেয়া হোক।

পাঁচ ঃ যে নেতার মুখ থেকে এসব ভাষণ ও বাণীসমূহ উচ্চারিত হয়েছে, তিনি হঠাৎ কোন গোপন আস্তানা থেকে শুধু এগুলো শোনানোর জন্য বেরিয়ে আসতেন না এবং শোনাবার পর আবার কোথাও চলে যেতেন না। এ আন্দোলন শুরু করার পূর্বেও তিনি মানব সমাজে জীবন যাপন করেছিলেন এবং পরেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সবসময় ঐ সমাজেই থাকতেন। মানুষ তার আলোচনা ও বক্তব্যের ভাষা এবং বাচনভংগীর সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিল। হাদীসসমূহ তার একটি বড় অংশ এখনও সংরক্ষিত আছে। পরবর্তী সময়ের আরবী ভাষাভিজ্ঞ মানুষ যা পড়ে সহজেই দেখতে পারেন যে, সেই নেতার বাচনভংগী কেমন ছিল। তাঁর স্বভাষী মানুষ সে সময়ও পরিষ্কার উপলব্ধি করতো এবং আরবী ভাষা জানা মানুষ আজও উপলব্ধি করে যে, এ গ্রন্থের (কুরআন) ভাষা ও বাকরীতি সেই নেতার ভাষা ও বাকরীতি থেকে অনেক ভিন্ন। এমন কি তাঁর ভাষণের মধ্যে যেখানে এ গ্রন্থের কোন বাক্যের উদ্ধৃতি আসে তখন উভয়ের ভাষার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীতে কোন মানুষ কি কখনো দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্টাইলে বছরের পর বছর কথা বলার ভান করতে সক্ষম হয়েছে বা হতে পারে অথচ দু'টিই যে, একই ব্যক্তির স্টাইল, সে রহস্য কখনো প্রকাশ পায় না? এ ধরনের ভান বা অভিনয় করে আকস্মিক বা সাময়িকভাবে সফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু একাধারে ২৩ বছর পর্যন্ত এমনটি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, এক ব্যক্তি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা অহী হিসেবে কথা বলে তখন তার ভাষা ও স্টাইল এক রকম হবে আবার যখন নিজের পক্ষ থেকে কথা বলে বা বক্তৃতা করে তখন তার ভাষা ও স্টাইল সম্পূর্ণ আরেক রকম হবে।

ছয় ঃ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান কালে সেই নেতা বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। কখনো তিনি বছরের পর বছর স্বদেশবাসী ও স্বগোত্রীয় লোকদের উপহাস, অবজ্ঞা ও চরম জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, কখনো তাঁর সংগী-সাথীদের ওপর এমন জুলুম করা হয়েছে যে, তারা দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কখনো শত্রুরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, কখনো তাঁর নিজেকেই স্বদেশভূমি ছেড়ে হিজরত করতে হয়েছে। কখনো তাঁকে চরম দারিদ্রকষ্ট সইতে এবং ভুখা জীবন কাটাতে হয়েছে। কখনো তাঁকে একের পর এক লাড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তাতে বিজয় ও পরাজয়

أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٣٥ أَمۡ خَلَقُواْ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ٣٦ أَمۡ عِندَهُمۡ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمۡ هُمُ ٱلۡمُصَۜيۡطِرُونَ ٣٧

কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এরা কি নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে? না কি এরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা? না কি পৃথিবী ও আসমানকে এরাই সৃষ্টি করেছে? প্রকৃত ব্যাপার হলো, তারা বিশ্বাস পোষণ করে না।[২৮]

তোমার রবের ভাণ্ডারসমূহ কি এদের অধিকারে? নাকি ঐ সবের ওপর তাদের কর্তৃত্ব চলে?[২৯]

উভয়টিই এসেছে। কখনো তিনি দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন এবং যেসব দুশমন তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল তাদেরকেই তাঁর সামনে অধোবদন হতে হয়েছে। কখনো তিনি এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করেছেন যা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটে থাকে। একথা স্পষ্ট যে, এ ধরনের নানা পরিস্থিতিতে কোন মানুষের আবেগ অনুভূতি এক রকম থাকতে পারে না। এসব রকমারি ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে সেই নেতা যখনই তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে কথা বলেছেন তখনই তাঁর মধ্যে স্বভাবসুলভ মানবোচিত আবেগ অনুভূতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যা এরূপ ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে একজন মানুষের মনে সচরাচর সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু এসব পরিস্থিতিতে তাঁর মুখ হতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা অহী হিসেবে যেসব কথা শোনা গিয়েছে তা ছিল মানবিক আবেগ–অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোন একটি ক্ষেত্রেও কোন কট্টর সমালোচকও অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে পারবে না যে, এখানে মানবিক আবেগ–অনুভূতির প্রভাব পড়েছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সাত ঃ এ গ্রন্থে যে ব্যাপক ও পূর্ণাংগ জ্ঞান পাওয়া যায় তা সে যুগের আরববাসী, রোমান, গ্রীক ও ইরানবাসীদের কাছে তো দূরের কথা এ বিংশ শতাব্দীর বড় বড় পণ্ডিতদেরও কারো ঝুলিতে নেই। বর্তমানে অবস্থা এই যে, দর্শন, বিজ্ঞান এবং সমাজ বিদ্যার কোন একটি শাখার অধ্যয়নে গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়ার পরই কেবল কোন ব্যক্তি জ্ঞানের সেই শাখার সর্বশেষ সমস্যাবলী জানতে পারে। তারপর যখন গভীর দৃষ্টি নিয়ে সে কুরআন অধ্যয়ন করে তখন জানতে পারে যে, এ গ্রন্থে সেসব সমস্যার একটি সুস্পষ্ট জবাব বিদ্যমান। এ অবস্থা জ্ঞানের কোন একটি শাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যেসব জ্ঞান বিশ্ব–জাহান ও মানুষের সাথে কোনভাবে সম্পর্কিত তার সবগুলোর ক্ষেত্রেই সঠিক। কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, ১৪ শত বছর পূর্বে আরব–মরুর এক নিরক্ষর ব্যক্তি জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এমন ব্যাপক দক্ষ ছিল এবং তিনি প্রতিটি মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে সেগুলোর একটি পরিষ্কার ও চূড়ান্ত জওয়াব খুঁজে পেয়েছিলেন?

কুরআনের মু'জিযা হওয়ার যদিও আরো অনেক কারণ আছে। তবে কেউ যদি শুধু এ কয়টি কারণ নিয়ে চিন্তা করে তাহলে সে জানতে পারবে কুরআন নাযিল হওয়ার যুগে

কুরআনের মু'জিয়া হওয়া যতটা স্পষ্ট ছিল আজ তার চেয়ে অনেক গুণে বেশী স্পষ্ট এবং ইনশায়াল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত স্পষ্টতর হতে থাকবে।

২৮. ইতিপূর্বে যেসব প্রশ্ন উথাপন করা হয়েছিলো তার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কাফেরদের বুঝানো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য তারা যেসব কথা বলছে তা কতটা অযৌক্তিক। এ আয়াতে তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দাওয়াত পেশ করছেন তার মধ্যে এমন কি আছে যে জন্য তোমরা ক্রোধান্বিত হচ্ছো? তিনি তো একথাই বলছেন যে, আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা এবং তোমাদের উচিত তাঁরই বন্দেগী করা। এতে তোমাদের ক্রোধান্বিত হওয়ার যুক্তিসংগত কি কারণ থাকতে পারে? তোমরা কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছো, কোন স্রষ্টা তোমাদের সৃষ্টি করেননি? নাকি তোমরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? কিংবা এ বিশাল মহাবিশ্ব তোমাদের তৈরী? এসব কথার কোনটিই যদি সত্য না হয়, আর তোমরা নিজেরাই স্বীকার করো যে তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ আর এই বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টাও তিনিই, তাহলে যে ব্যক্তি তোমাদের বলে, সেই আল্লাহই তোমাদের বন্দেগী ও উপাসনা পাওয়ার অধিকারী সেই ব্যক্তির প্রতি তোমরা এত ক্রোধান্বিত কেন? আসলে ক্রোধোদ্দীপক ব্যাপার তো যে স্রষ্টা নয় তার বন্দেগী করা এবং যিনি স্রষ্টা তার বন্দেগী না করা। তোমরা মুখে একথা অবশ্যই স্বীকার করো যে, বিশ্ব–জাহান ও তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ। কিন্তু সত্যিই যদি একথায় বিশ্বাস থাকতো তাহলে তাঁর বন্দেগীর প্রতি আহবানকারীর পেছনে এভাবে আদাপানি খেয়ে লাগতে না।

এটা ছিল এমন একটি তীক্ষ্ণ ছুঁচালো প্রশ্ন যা মুশরিকদের আকীদা–বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকেই কাঁপিয়ে দিয়েছে। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে আছে, বদর যুদ্ধের পর বন্দী কুরাইশদের মুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে জুবাইর ইবনে মুতয়িম মদীনায় আসে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের নামাযে ইমামতি করছিলেন। নামাযে তিনি সূরা তূর পড়ছিলেন। তার নিজের বর্ণনা হচ্ছে, নবী (সা) যখন সূরার এ আয়াত পড়ছিলেন তখন মনে হলো, আমার কলিজাটা বুঝি বক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেদিন এ আয়াত শুনে তার মনে ইসলাম বদ্ধমূল হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এটি তার ইসলাম গ্রহণ করার একটি বড় কারণ হয়েছিল।

২৯. মক্কার কাফেরদের প্রশ্ন ছিল, শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই কেন রসূল বানানো হলো? এটি তাদের সে প্রশ্নের জবাব। এ জবাবের তাৎপর্য হচ্ছে, এসব লোককে গায়রুল্লাহর ইবাদাতের গোমরাহী থেকে মুক্ত করার জন্য কাউকে না কাউকে তো রসূল বানিয়ে পাঠাতেই হতো। এখন প্রশ্ন হলো, সে সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করবেন? আল্লাহ কাকে তাঁর রসূল মনোনীত করবেন আর কাকে করবেন না সে সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করবে?, এরা যদি আল্লাহর মনোনীত রসূলকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, হয় তারা নিজেদেরকে আল্লাহর রাজ্যের মালিক মনে করে নিয়েছে। নয়তো তারা ধারণা করে বসে আছে যে, বিশ্ব জাহানের মালিক মনিব তো আল্লাহ তা'আলাই থাকবেন, তবে সেখানে বাস্তব কর্তৃত্ব চলবে তাদের।

أَمۡ لَهُمۡ سُلَّمٌ يَسۡتَمِعُونَ فِيهِۖ فَلۡيَأۡتِ مُسۡتَمِعُهُم بِسُلۡطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمۡ لَهُ ٱلۡبَنَٰتُ وَلَكُمُ ٱلۡبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ أَجۡرًا فَهُم مِّن مَّغۡرَمٍ مُّثۡقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمۡ عِندَهُمُ ٱلۡغَيۡبُ فَهُمۡ يَكۡتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمۡ يُرِيدُونَ كَيۡدًاۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلۡمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمۡ لَهُمۡ إِلَٰهٌ غَيۡرُ ٱللَّهِۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴿٤٣﴾

তাদের কাছে কি কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা উর্ধজগতের কথা শুনে নেয়? এদের মধ্যে যে শুনেছে সে পেশ করুক কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহর জন্য কি কেবল কন্যা সন্তান আর তোমাদের জন্য যত পুত্র সন্তান?[৩০]

তুমি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, তাদের ওপর জোরপূর্বক চাপানো জরিমানার বোঝার নীচে তারা নিষ্পেষিত হচ্ছে?[৩১]

তাদের কাছে কি অদৃশ্য সত্যসমূহের জ্ঞান আছে যার ভিত্তিতে তারা লিখছে?[৩২]

তারা কি কোন চক্রান্ত আঁটতে চাচ্ছে?[৩৩] *(যদি তাই হয়) তাহলে কাফেররাই উল্টো নিজেদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়বে।*[৩৪]

আল্লাহ ছাড়া কি তাদের আর কোন ইলাহ আছে? যে শির্ক তারা করছে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।[৩৫]

৩০. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যসমূহে একটা বিরাট যুক্তি-তর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এর বিস্তারিত রূপ হলো, তোমরা যদি রসূলের কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাও তাহলে সত্যকে জানার জন্য তোমাদের কাছে কি উপায় ও মাধ্যম আছে? তোমাদের কেউ কি উর্ধজগতে আরোহণ করে আল্লাহ তা'আলা কিংবা তাঁর ফেরেশতাদের নিকট থেকে সরাসরি একথা জেনে নিয়েছে যে, যেসব আকীদা-বিশ্বাসের ওপর তোমাদের বাতিল ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত তা পুরোপুরি বাস্তব সম্মত ও সত্য? কেউ যদি এ দাবী করতে চায় তাহলে সে সামনে আসুক এবং বলুক, সে কবে কিভাবে উর্ধজগতে আরোহণের অধিকার লাভ করেছে এবং সেখান থেকে কি জ্ঞান সে নিয়ে এসেছে? কিন্তু এটা যদি তোমাদের দাবী না হয়, তাহলে নিজেরাই ভেবে দেখো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর সন্তান আছে বলে তোমরা যে দাবী করছো তাও আবার কন্যা সন্তান—যাকে নিজের জন্য তোমরা লজ্জা ও অপমানের কারণ বলে মনে করো—এর চেয়ে অধিক হাস্যকর ধারণা আর কিছু হতে পারে কি? প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তোমরা এ ধরনের স্পষ্ট মূর্খতার অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছো, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে জ্ঞানের আলো পেশ করছে, তোমরা তার প্রাণের দুশমন হয়ে দাঁড়াচ্ছো।

৩১. প্রশ্নের মূল লক্ষ কাফেররা। অর্থাৎ তোমাদের কাছে রসূলের যদি কোন স্বার্থ থাকতো এবং নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তিনি এসব তৎপরতা দেখাতেন তাহলে তাঁর নিকট থেকে সরে যাওয়ার একটা যুক্তিসংগত কারণ অন্তত তোমাদের থাকতো। কিন্তু তোমরা জান এ আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিস্বার্থ, শুধু তোমাদের কল্যাণের জন্যই তিনি জীবনপাত করছেন। এরপরও ধির স্থির মন–মেজাজ নিয়ে তাঁর কথা শোনার মত উদারতা তোমাদের না থাকার কি কারণ থাকতে পারে? এ প্রশ্নের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সমালোচনাও বিদ্যমান। সারা দুনিয়ার ভণ্ড ধর্মগুরুরা এবং ধর্মীয় আস্তানার সেবকদের মত আরবেও মুশরিকদের ধর্মীয় নেতা এবং পণ্ডিত পুরোহিতরা খোলাখুলি ধর্মীয় কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, একদিকে আছে এসব ধর্ম ব্যবসায়ীরা যারা তোমাদের নিকট থেকে প্রকাশ্যে নজর–নিয়াজ এবং প্রতিটি ধর্মীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য পারিশ্রমিক আদায় করছে। অপরদিকে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে, বরং নিজের ব্যবসায়–বাণিজ্য ধ্বংস করে অত্যন্ত যুক্তিসংগত প্রমাণ দিয়ে তোমাদেরকে দীনের সোজা পথ দেখানোর চেষ্টা করছে অথচ তোমরা তার নিকট থেকে সরে যাচ্ছো এবং তাদের দিকে দৌড়ে অগ্রসর হচ্ছো এটা চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি?

৩২. অর্থাৎ রসূল তোমাদের সামনে যেসব সত্য পেশ করছেন তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তোমাদের কাছে এমন কি প্রমাণ আছে যা পেশ করে দাবী করতে পারো দৃশ্যমান বস্তু ছাড়া চোখের আড়ালে যেসব সত্য লুকিয়ে আছে তোমরা সরাসরি তা জানো? তোমরা কি সত্যিই জানো যে, আল্লাহ এক নন এবং তোমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো তারাও আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারের অধিকারী? তোমরা কি সত্যিই ফেরেশতাদের দেখেছো; তারা যে মেয়ে তা জানতে পেরেছো এবং নাউযুবিল্লাহ আল্লাহর ঔরসেই তারা জন্ম নিয়েছে, তোমরা কি সত্যিই জানো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন অহী আসেনি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বান্দার কাছে তা আসতেও পারে না? তোমরা কি সত্যিই একথা জানতে পেরেছো যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন হবে না, আখেরাত কায়েম হবে না যেখানে মানুষের হিসেব–নিকেশ করে তাকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে? তোমরা এ ধরনের কোন জ্ঞানের দাবী করলে একথা লিখে দিতে কি প্রস্তুত আছ যে, তোমরা এ সম্পর্কে রসূলের পেশকৃত বর্ণনা ও তথ্য যে অস্বীকার করছো তার কারণ হলো পরদার পেছনে উঁকি দিয়ে তোমরা দেখে নিয়েছো, রসূল যা বলছেন তা বাস্তব ও সত্য নয়। এখানে কেউ একথা বলে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন যে, এ জবাবে ঐ সব মানুষ যদি হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে তা লিখে দেয় তাহলে কি এসব যুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে না? কিন্তু এরূপ সন্দেহ করা ভুল। কারণ, হঠকারিতা করে যদি তা লিখেও দেয় তাহলেও যে সমাজে জন সমক্ষে এ চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছিল সেখানে সাধারণ মানুষ অন্ধ ছিল না। প্রত্যেকেই জানতে পারতো, একথা নিছক হঠকারিতা করেই লিখে দেয়া হয়েছে এবং রসূলের বর্ণনাসমূহ এ জন্য অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, তার অসত্য ও বাস্তবতা বিরোধী হওয়া সম্পর্কে কেউ প্রত্যক্ষ ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করেছে।

৩৩. মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়া ও তাঁকে হত্যা করার জন্য একত্রে বসে যে সলাপরামর্শ করতো ও ষড়যন্ত্র পাকাতো এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

এরা যদি আসমানের একটি অংশ পতিত হতে দেখে তাহলেও বলবে, এ তো ধাবমান মেঘরাশি।[৩৬] অতএব, হে নবী, তাদেরকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। যাতে তারা সে দিনটির সাক্ষাত পায় যেদিন তাদেরকে মেরে ভূপাতিত করা হবে। সেদিন না তাদের কোন চালাকি কাজে আসবে, না কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে এগুবে। আর সেদিনটি আসার আগেও জালেমদের জন্য একটা আযাব আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[৩৭]

হে নবী ! তোমার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো।[৩৮] তুমি আমার চোখে চোখেই আছ।[৩৯] তুমি যখন উঠবে তখন তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করো[৪০] তাছাড়া রাত্রিকালেও তার তাসবীহ পাঠ করো।[৪১] আর তারকারাজি যখন অস্তমিত হয় সে সময়ও।[৪২]

৩৪. এটি কুরআনের সুস্পষ্ট ভবিষ্যতবাণীসমূহের একটি। মক্কী যুগের প্রথম দিকে যখন মুষ্টিমেয় সহায় সম্বলহীন মুসলমান ছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহ্যত আর কোন শক্তি ছিল না। গোটা জাতিই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল এবং প্রত্যেকেই ইসলাম ও কুফরী শক্তির নিতান্তই অসম মোকাবিলা প্রত্যক্ষ করছিল। কেউ–ই সে সময় ভাবতে পারেনি যে, কয়েক বছর পরই এখানে কুফরী শক্তির মূলোৎপাটিত হতে যাচ্ছে। স্থূল দৃষ্টির অধিকারীরা দেখতে পাচ্ছিলো, কুরাইশ ও গোটা আরবের বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনকে উৎখাত করে ছাড়বে। এ পরিস্থিতিতেও কাফেরদেরকে চূড়ান্ত ও পরিষ্কার ভাষায় চ্যালেঞ্জ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ আন্দোলনকে হেয় করার জন্য যত অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র তোমরা করতে চাও তা করে দেখো। ঐ ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল উল্টো তোমাদের বিরুদ্ধেই যাবে। তোমরা কখনো এ আন্দোলনকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে না।

৩৫. প্রকৃত ব্যাপার হলো, যাদেরকে তারা ইলাহ বানিয়ে রেখেছে প্রকৃতপক্ষে তারা ইলাহ নয় এবং শিরক আগাগোড়া একটি ভিত্তিহীন জিনিস। তাই যে ব্যক্তি তাওহীদের

আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সাথে আছে সত্যের শক্তি। আর যারা শির্কের সহযোগিতা করছে, তারা একটি অবাস্তব ও অসত্য জিনিসের জন্য লড়াই করছে। এ লড়াইয়ে শির্ক কি করে বিজয় লাভ করবে?

৩৬. একথার উদ্দেশ্য এক দিকে কুরাইশ নেতাদের হঠকারিতার মুখোস খুলে দেয়া, অন্যদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সংগী–সাথীদের সান্ত্বনা দেয়া। নবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের মনে বারবার এ আকাংখা জাগতো যে, এসব লোককে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন মু'জিযা দেখানো হোক যার দ্বারা মুহাম্মাদের (সা) নবুওয়াতের সত্য বুঝতে পারবে। তাই বলা হয়েছে, এরা যদি নিজ চোখে কোন মু'জিযাও দেখে তবুও তার কোন না কোন অপব্যাখ্যা করে কুফরীর ওপর অবিচল থাকার অজুহাত খুঁজে নেবে। কারণ, তাদের মন ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত নয়। কুরআন মজীদের আরো কয়েকটি স্থানেও তাদের এ হঠকারিতার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা আনআমে বলা হয়েছে, আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাও পাঠাতাম, মৃত ব্যক্তিরা এদের সাথে কথা বলতো এবং এদের চোখের সামনে সারা দুনিয়ার সবকিছু এনে জড়ো করে দিতাম তবুও এরা ঈমান আনতো না। (আয়াত ১১) সূরা হিজরে বলা হয়েছে, আমি যদি তাদের জন্য আসমানের কোন দরজা খুলেও দিতাম আর এরা প্রকাশ্য দিবালোকে সে দিকে উঠতে থাকতো তারপরও একথাই বলতো, আমাদের চোখ প্রতারিত হচ্ছে, আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে। (আয়াত ১৫)

৩৭. এটি সূরা আস সাজ্দার ২১ আয়াতের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি। সেখানে বলা হয়েছে "সেই বড় আযাবের পূর্বে আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে কোন না কোন ছোট আযাবের স্বাদ ভোগ করাতে থাকবো। হয়তো এরা তাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণ থেকে বিরত হবে।" অর্থাৎ দুনিয়াতে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত ও জাতিগত পর্যায়ে আযাব নাযিল করে আমি তাদের একথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবো যে, ওপরে কোন এক উচ্চতর শক্তি তাদের ভাগ্যের ফায়সালা করছে। তাঁর ফায়সালা পরিবর্তন করার শক্তি কেউ রাখে না। তবে যারা জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে আছে তারা এ ঘটনাবলী থেকে পূর্বেও কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং ভবিষ্যতেও কখনো করবে না। দুনিয়াতে যেসব বিপর্যয় আসে তারা তার অর্থ বুঝে না। তাই তারা এসব বিপর্যয়ের এমন এমন সব ব্যাখ্যা করে যা তাদেরকে সত্য উপলব্ধি করা থেকে আরো দূরে নিয়ে যায়। নিজেদের নাস্তিকতা বা শির্কের ত্রুটি ধরা পড়ে তাদের মেধা ও মস্তিষ্ক এমন ব্যাখ্যার দিকে কখনো আকৃষ্ট হয় না। একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এ বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ان المنافق اذا مرض ثم اعفى كان كالبعير عقله اهله ثم ارسلوه فلم يدر لم عقلوه ولم يدر لم ارسلوه (ابو داؤد ، كتاب الجنائز)

"মুনাফিক যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরে যখন সুস্থ হয়ে যায় তখন তার অবস্থা হয় সেই উটের মত যাকে-তার মালিক বেঁধে রাখলো কিন্তু সে বুঝলো না তাকে কেন বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং তারপর আবার যখন খুলে দিল তখনও সে কিছু বুঝলো না তাকে কেন ছেড়ে দেয়া হলো।" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, টীকা ৪৫; আন নাম্‌ল, টীকা ৬৬; আল আনকাবূত, টীকা ৭২ ও ৭৩)।

৩৮. আরেকটি অর্থ হতে পারে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আপন প্রভুর নির্দেশ পালন করতে বদ্ধপরিকর থাকো।

৩৯. অর্থাৎ আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছি। তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেইনি।

৪০. একথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং এখানে সবগুলো অর্থ গ্রহণীয় হওয়া অসম্ভব নয়।

একটি অর্থ হচ্ছে, তুমি যখনই কোন মজলিস থেকে উঠবে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ করে উঠবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ নির্দেশ পালন করতেন এবং মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন কোন মজলিস থেকে উঠার সময় আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ করে। এভাবে সেই মজলিসে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তার কাফ্ফারা হয়ে যায়। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী এবং হাকেম হযরত আবু হুরাইরার (রা) মাধ্যমে নবীর (সা) এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসলো এবং সেখানে অনেক বাকবিতণ্ডা করলো সে যদি উঠে যাওয়ার সময় বলে ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك ، اشهد ان لا اله الا انت ، استغفرك واتوب اليك –

"হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসাসহ তাসবীহ করছি। আমি সাক্ষ দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার কাছে তাওবা করছি।"

তাহলে সেখানে যেসব ভুল-ত্রুটি হবে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন।

এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা ঘুম থেকে জেগে বিছানা ছাড়বে তখন তাসবীহসহ তোমার রবের প্রশংসা করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিও নিজে আমল করতেন এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর একথাগুলো বলার জন্য সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন ঃ

لا اله الا اللّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير سبحان اللّه والحمد للّه ولا اله الا اللّه واللّه اكبر ولا حول ولا قوة الا باللّه – (مسند احمد ، بخارئ بروايت عبادہ بن الصامت)

এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ দ্বারা তার সূচনা করো। এ হুকুম পালনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকবীর তাহরীমার পর নামায শুরু করবে একথা বলে ঃ

سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

এর চতুর্থ অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা আল্লাহর পথে আহবান জানানোর জন্য প্রস্তুত হবে তখন আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ দ্বারা তার সূচনা করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশটিও স্থায়ীভাবে পালন করতেন। তিনি সবসময় আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা তার খুতবা শুরু করতেন।

তাফসীর বিশারদ ইবনে জারীর এর আরো একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। সে অর্থটি হচ্ছে, তোমরা যখন দুপুরের আরামের পর উঠবে তখন নামায পড়বে। অর্থাৎ যোহরের নামায।

৪১. এর অর্থ মাগরিব, ইশা এবং তাহজ্জুদের নামায। সাথে সাথে এর দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর যিকরও বুঝানো হয়েছে।

৪২. তারকারাজির অস্তমিত হওয়ার অর্থ রাতের শেষভাগে এগুলোর অস্তমিত হওয়া এবং ভোরের আলো দেখা দেয়ায় তার আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া। এটা ফজরের নামাযের সময়।